



## জীবন যুদ্ধে অপরাজেয় এক বীর কন্যার মুখোমুখী

-অজয় রায়

হেমন্তের এক হিমেল সন্ধ্যায় ভাস্কর ফেরদৌসী  
প্রিয়ভাষিণীর সাথে আলাপচারিতা

গত ২৮শে অক্টোবর সন্ধ্যেবেলা মুখোমুখী হয়েছিলাম এক অনন্য রমনীর - ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী। প্রায় তিন ঘণ্টা স্থায়ী হয়েছিল এই আলাপচারিতা। আলাপের ফাঁকে ফাঁকে চা সহ নানা হাঙ্কা আহার্যের বাহারী পরিবেশন ও সুশীল মনের অধিকারী ও সংস্কৃতিবান স্বামী আহসান উল্লাহ আহমেদের যোগদান ও সরেশ মন্তব্য আলাপচারিতার পরিবেশেকে আরও মনোমুক্ত ও প্রাণবন্ত করে তুলেছিল।

তিনি কন্যা দুই পুত্র ও আহমদ সাহেবকে নিয়ে সুখের সংসার ও আপাত সফল জীবনের পথচাতে যে এত যুদ্ধ, এত বেদনা, এত ক্লেশ ও ক্লেদ, এত করুণ কাহিনী জুড়ে রয়েছে তা বাইর থেকে বুঝবার উপায় নেই। পুত্র কন্যাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। আগের ঘরের তিনি পুত্রকেও আহমেদ সাহেবের চেষ্টায় জীবনে দাঁড় করিয়েছেন তিনি।

অনেক বিষয়ের মধ্যে আমাদের আলোচনায় স্থান পেয়েছিল তাঁর অনন্য শিল্পকর্ম, জীবন সংগ্রামের নানা দিক, ছেলেবেলার কথা, মায়ের কথা, বাবার কথা, মাতামহের কথা ...., রাজনীতির কথা, সন্ত্রাস খচিত উগ্র মৌলবাদ আর সাম্প্রদায়িকতার কথা ... এ রকম অনেক অকথিত কাহিনী। এ কাহিনী কখনও আনন্দ আর সাফল্যের ওজ্জ্বল্যে উত্তোলিত, আবার কখনও তা বেদনার আর্ত চিকারে অবসিত, আবার কখনও এ কাহিনী জীবন সংগ্রামের অপর নাম। অক্টোবরের এক দুষ্ট হিমেল সন্ধ্যায় একজন বিজ্ঞানীর অনুসন্ধিৎসু মন ও একটি উদার সুকুমার শৈল্পিক মন মুখোমুখী হয়েছিল। আমাদের বয়সের পার্থক্য ছিল - প্রিয়ভাষিণী ষাট ছুই ছুই, আর আমি একাত্তর অতিক্রম করছি।

### শিল্পী জীবন

শিল্প ও ভাস্কর্য নিয়েই আলাপের সূত্রপাত। জিজ্ঞেস করেছিলাম শিল্পীর কোন যাদুময় স্পর্শে নীরস কাঠের মধ্যে তিনি প্রাণের সম্পত্তির করেন। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ না নিয়েও কেবল মাত্র জীবনদৃষ্টি আর শিল্প মননের স্পর্শ দিয়ে কি কোনো শিল্প নির্মাণ করা সম্ভব?

বিন্যম প্রিয়ভাষিণীর উত্তর ছিল, না তিনি কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেন নি, “সেই অর্থে আপনি বলতে পারেন, আমি স্বশিক্ষিত, স্টেডিয়ারিত। কখন ঠিক মনে করতে পারি না, তবে সন্তুরের সেই অশান্ত দিনগুলোর মধ্যেই আমার শিল্প-চেতনা, শিল্পীর চোখ ক্রমশ মুকুলিত হতে থাকে। হয়তো বা অত্যধিক শারীরিক-মানসিক ক্লিষ্টতা আর অত্যাচার আমাকে বাঁচবার তাগিদ দিয়েছিল, এক নতুন সন্তা নিয়ে। সেই সময় নানা স্থানে নিজেকে ও পরিবারকে বাঁচবার তাগিতে যখন ইতস্ততঃ পালিয়ে বেরাচ্ছিলাম - পথে পথে, রাস্তার পাশে, নদীর তীরে, ভাঙ্গা বাড়ীতে নির্যাতিত মানুষের লাশ পড়ে থাকতে দেখেছি, কেউ মূমুর্ষ অবস্থায় আর্ত চিকারে বাঁচবার প্রাণান্ত চেষ্টায় তখনও যুদ্ধ করছে নিজে বাঁচতে, অন্যকে বাঁচাতে। তখন মনে হয়েছিল মৃত, জীবন্ত, আমরা জীবন্তরা সবাই যেন যুদ্ধ করছি নিজেকে বাঁচাতে, অন্যকে বাঁচাতে। জীবনকে আমরা সবাই এত ভালবাসি। এ ছবি আমার হৃদয়ে, মনে, আমার অঙ্গে যেন চিরতরে গেঁথে গিয়েছিল - সে ছবির নাম ‘আমরা জীবনকে ভালবাসি, জীবনের জন্য যুদ্ধ করি’।”

আমার জিজ্ঞাসা ছিল, “এই চেতনাবোধের ঘূর্মন্ত ছবিই কি পরবর্তীকালে আপনার শিল্প মনের বিকাশের প্রেরণা বা ভিত্তি ছিল ?” প্রিয়ভাষিণীর উত্তর অনেকটা এ রকম : “ঠিক বলতে পারব না। আপনার মত করে তো ভাবিনি। তবে আমার মনে আছে, সেই যুদ্ধকালীন সময়ে একদিন অসংখ্য মৃত লাশের পাশে দু চারটি মড়া গাছের একটি গুড়ি বা বিশাল কাণ্ড পড়ে থাকতে দেখেছি। তুলনা করেছি সেই মৃত মানুষের দেহের সঙ্গে এই নীরস প্রাণহীন গাছের কাণ্ডের কোন তফাও নেই। পরে স্বামীর কর্মজীবনের সাথে নানা স্থানে থাকা কালে - পথে চলতে এ ধরণের মৃত গাছকে দেখলেই আমার সেই লাশের কথা মনে পড়ে যেত, এই মৃত গাছের নানা অংশে দেখতে পেতাম জীবনের চিহ্ন, কোন সময় মনে হত জীবন যুদ্ধে পরাজিত এক অসহায় নারী বা পুরুষের অবয়ব, কখনও যেন মনে হতো একটি সজীব প্রাণ বেরিয়ে আসতে চাইছে আলোর দিকে, মুক্তির তাগিদে। এ সবই আমার মনের কল্পনা। পরবর্তীকালে সেই চেতনা বোধ থেকেই আমার মৃত গাছের প্রতি আকর্ষণ বাড়তে থাকে, মনের মাধুরী মিশিয়ে বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা করি নিজের মনের কল্পনাকে সকলের কাছে বাঞ্ছিয়ে করে তুলতে এই তথাকথিত নীরস কাঠের মাধ্যমকে আশ্রয় করে। এর ফলেই হয়তো আমি কখন যেন আপনাদের চোখে ভাস্কর ফেরদৌসীতে রূপান্তরিত হয়েছি। আপনাদের স্নেহে ভালবাসায় সিঙ্গ হয়েছি - যা আমাকে পথ চলতে জ্বালানি

যুগিয়েছে। এই পথ চলার জুলানি জোগানে শুধু আপনারা নন, আমার তিনি কন্যা আর স্বামী সব সময় আমার পাশে থেকেছেন।”

আমার একটি জিজ্ঞাস্য ছিল, “আপনার আগের সব কাজগুলোতেই লক্ষ্য করেছি মড়া গাছের মধ্যেই আপনি নানা অবয়ব কল্পনা করে তাকে আমাদের কাছে মূর্ত করতে প্রয়াস পান জীবন্ত করে, আজকাল দেখছি মৃত শুঙ্ক কাঠের আধারে সজীব গাছের চারা বা লতা-গুল্ম বা ফার্ণ রোপন করছেন। কেন? মানছি নীরস প্রাণহীন কাঠ খণ্ডের সাথে সজীব সবুজ গাছের সম্মিলন এক চমৎকার অনুভূতির জন্ম দেয়। এ আইডিয়া মাথায় এল কি করে? এ ধরনের কাজের মধ্য দিয়ে আপনি কী মেসেজ দিতে চান?”

ফেরদৌসীর উত্তর ছিল : “ঠিক কোন বাণী প্রেরণের উদ্দেশ্য নিয়ে এ সব কাজে উদ্যোগ নিয়েছি তা নয়। আপনার প্রশ্নের মত করে বিষয়টি দেখিও নি। হঠাৎই খেয়াল হয়েছিল তাই করা, কোন সুচিত্তিত ভাবনা থেকে নয়। তবে আমার সব কাজের মধ্যে একটি অন্তশ্লিলা স্নেত রয়েছে তা হল বাঁচবার তাগিদ, জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার অভিলাষ। নীরস তরুণকে জীবন্ত করার প্রয়াস-আমার ভাস্কর্যের মধ্যদিয়ে হল এ মানুষের জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার বাসনারই প্রতিচ্ছবি। শুঙ্ক কাঠে সবুজ প্রাণের রোপন হয়তো বা আমার সেই অবচেতন মনের দ্যোতনার

বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে আমার শিল্পী মন, ঠিক বলতে পারব না।”

আমি বলেছিলাম, “প্রথম যখন আমি আপনার এ ধরণের মৃত-জীবন্ত মিশ্র ভাস্কর্য দেখি তখন আমার মনে অন্য ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল। অতি প্রাচীন মহেঞ্জদারোর পুরাকীর্তিতে অনেক মৃৎ শিল্পের মধ্যে এক ধরনের শিল্প দেখা যায়- যোনীর গহ্বর থেকে সবুজ লতা-গুল্ম বা বৃক্ষচারা রেরিয়ে আসা এক অনন্যা গর্ভবতী নারী মূর্তি। সেই প্রাচীন শিল্পী এ দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে নারী হল প্রকৃতি স্বরূপা, প্রকৃতি ধরিত্রী যেমন বৃক্ষাদি, শাক, শস্য উৎপাদন করে, নারীও তেমনি প্রাণের সৃষ্টিদায়িনী। এ কারণেই দেবী দুগার্কে বলা হয় শাকস্তরী-অর্থাৎ যিনি বৃক্ষ লতা শাক শস্য উৎপাদনকারিনী। আপনি হয়তো এ ধরনের ভাব থেকে এসব কর্ম নির্মাণ করেছেন, এমনটি ভেবেছিলাম। এখন দেখছি আমার ধারণার সাথে মিল নেই।”



প্রিয়ভাষিণীর উত্তর ছিল “মা দুর্গার এই শস্যদায়িনী রূপের সাথে বা মহেঞ্জদারোর ঐ মৃৎ শিল্পের সাথে আমার পরিচয় নেই, তবে আমার কর্মকে সে ভাবে আপনি যদি ব্যাখ্যা করতে চান - যে প্রকৃতিই হল জীবনের প্রতীক, জীবনের ধারক - আমার মানতে আপত্তি নেই। তবে অত শত ভেবে আমি এ সব করি নি, মনের খেয়ালেই করেছি।”

আমার আর একটি বিষয় জানার ছিল এই ভাস্করের কাছে তা হল প্রকৃতি খেয়ালের বশেই গাছে, পর্বত কন্দরে এবং অন্য প্রাকৃতিক মাধ্যমে নানা ধরনের বৈচিত্র্যময় ক্ষেত্র, দৃশ্যপট বা অবয়ব একে যায়। মানুষ তাঁর কল্পনার মাধুরী মিশিয়ে তৈরি করে নানা চিত্রকল্প। প্রকৃতিই এখানে শিল্পী। আমি ফেরদৌসীর কাছে জানতে চেয়েছিলাম কোন নীরস গাছের গুড়িতে কোন দৃশ্যপট তাঁর কাছে ধরা পরলে তাকেই কি তিনি শিল্পীর পরশ দিয়ে প্রস্ফুটিত করে তোলেন সবার জন্য? সাধারণভাবে প্রিয়ভাষিণীকে বলা হয়ে থাকে ‘নৈসর্গিক ভাস্কর’। তিনি যদি প্রকৃতির অস্পষ্ট ছবিকেই, যেমন ধরা যাক কোনো শুকনো গাছের দেহে প্রকৃতির আঁকা কিছু এলোমেলো রেখা আর্চ ঝুলন্ত শিকড় দেখে কোনো মনের কাছে প্রতিভাত হল কোন রমণীর আলুলায়িত কেশ - নেমে এসেছে একটি মুখশ্রীকে পশ্চাতে রেখে। শিল্পী এই আলুলায়িত কেশ অস্পষ্ট রমণীকে আরও মূর্তভাবে তুলে ধরলেন শিল্পীর নান্দনিক ছোঁয়ায়। এ ধরণের কর্মকে অবশ্যই

বলা যেতে পারে নিসর্গ ভাস্কর্য। কিন্তু প্রিয়ভাষিণীর কাছে আমার প্রশ্ন ছিল তিনি কি কখনও সামান্য একখণ্ড অপ্রয়োজনীয় কাঠখণ্ড দেখে মনের গভীরে কোন অনুভূতির অনুরূপ শুনতে পেয়েছিলেন কিনা যা কিনা মুদ্রিত হয়েছিল তাঁর অন্তরে; পরবর্তীকালে তিনি এই মনের গভীরে মুদ্রিত থাকা অনুভূতিকে প্রকাশ রূপ দিয়েছিলেন? অর্থাৎ আমি জানতে চেয়েছিলাম তিনি নিতান্তই প্রকৃতির কাজে বিমোহিত ভাস্কর নাকি তাঁর কাজে ইম্প্রেশনিজমের বিমূর্ততা মূর্ত হয়ে ধরা পড়েছে কখনো কখনো? তিনি স্বীকার করেছেন কখনো কখনো সে ধরনের অনুভূতি জেগেছে, বিস্তৃত মনে হয় কঠিন বাস্তবতা তাকে বেশীদূর এগুতে দেয় নি। হয়তো মনে আঁকা প্রথম অনুভূতিটিকে প্রকাশ করতে গিয়ে নানা জটিলতায় মুদ্রণটিই ফিঁকে হয়ে গেছে নিজের অজান্তেই। তখন আশেপাশের পরিবেশই শিল্পীকে তাড়িত করেছে বেশী।

কোলাজ বা নানা ঔপদানিক মিশ্রণে সমন্বিত শিল্প কর্মেও ফেরদৌসী নিপুণতা প্রদর্শন করেছেন। পাঠশালা, ঐরাবত, স্মৃতির আনন্দ এর কয়েকটি উদাহরণ। পাঠশালায় উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে গাছের ডালপালা, লোহার শিক, পোড়া কাঠ ইত্যাদি। তাঁর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ও উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্মের মধ্যে রয়েছে ‘বধ্যভূমি একান্তর’, যা তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদের বিনিময়ে প্রত্যক্ষ করেছেন অনেক কাছ থেকে, উপাদান ব্যবহার করেছেন নিম্নাছের শিকড়, ‘স্টপ জেনোসাইড’, ‘একান্তরের দিনগুলি’, ‘১৯৭১ সনের বিশ্বত সময়’, ‘অবসরের গান’, ‘শঙ্খমালা’, ‘চারিপাশে বনের বিশ্বয়’, ‘অশ্বথ বটের পথে’, ‘জলসিঙ্গি নদীটির পারে’ ইত্যাদি।

আমার সেদিনের জন্য শেষ কৌতুহল ছিল তাঁর অনেক শিল্পকর্মের শিরোনামের সাথে কোনো কোনো মহৎ কবির বাণীকে তিনি কেন সম্পৃক্ত করেন? এটি কি ইচ্ছাকৃত? তিনি কোন্টি আগে স্থির করেন কোন ভালো লাগা কবির বাণীকে শিল্পকর্মে রূপ দেয়া, নাকি আগে শিল্পকর্মটি সৃষ্টি করে শিরোনাম দেয়ার পর কবির বাণী খুঁজে ফেরেন আর কর্মের সাথে যুক্ত করেন। এরও স্পষ্ট উত্তর মেলে নি। ফেরদৌসী আমাকে যা বুবাতে চেয়েছেন তা হল যে দুটোই ঘটেছে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথমে ভাস্কর্যটি সমাপন করেছেন। তবে উল্টোও ঘটেছে— যেমন কবি জীবনানন্দের একটি কবিতার অংশ দীর্ঘদিন থেকে মনে গেঁথে ছিল, “একদিন জলসিঙ্গি নদীটির পারে এই বাংলার মাঠে বিবর্ণ বটের নীচে শুয়ে রব”– এটিই ভাস্কর্যে রূপ পেল অনেক দিন পরে (২০০৭) দুটি পাশাপাশি রাখা নৌকার মধ্য দিয়ে যার নামাঙ্কন হল ‘জলসিঙ্গি নদীটির পারে’ (at Jalsiri Riverbank). তাঁর আর একটি চমৎকার ভাস্কর্য ‘১৯৭১ সনের বিশ্বত সময়’ - যে একান্তরকে আমরা সবাই ভুলে গেছি সেই বেদনাবিধুর ১৯৭১ কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী। আর সাথে জুড়ে দিয়েছেন জীবনানন্দের কবিতার পঙ্কজিমালা মুক্তের মত :

‘মনে হয় বাংলার জীবনে সক্ষট

শেষ হয়ে গেছে আজ; - চেয়ে দ্যাখো কতো শতাব্দীর বট  
হায়ার সবুজ পাতা লাল ফল বুকে ল'য়ে শাখার ব্যজনে

আকাঙ্ক্ষার গান গায়’

আমি তাঁর কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম – ‘আপনার শিল্পকর্মকে নানা জনে নানাভাবে মূল্যায়ন করেছেন যেমন আমাদের দেশের একজন নামকরা চিত্রশিল্পী এস এম সুলতান বলেছিলেন, “হেনরি মুর যেমন প্রস্তরে ‘বিশুদ্ধতার রূপ’ (purity of form) খুঁজে পেয়েছিলেন, ঠিক তেমনি ফেরদৌসী বৃক্ষের মধ্যে তা আবিষ্কার করেছেন।” সাহিত্যিক

সেলিনা হোসেন প্রিয়ভাষিণীর শিল্পকে বর্ণনা করেছেন সাহিত্যের ভাষায় এভাবেঃ

“তিনি একটি শুকনো ডালকে প্রাণবন্ত করেন। তিনি একটি ভাঙ্গা কাঠে ফুল ফোটান। একটি গাছের শেকড়কে হাঁসার আকার দেন। ... কোনো কোনো নিসর্গের ভাস্কর্যে শুকনো উপকরণের সাথে সতেজ গাছের সংমিশ্রণ ঘটান। অঙ্গুত সুন্দর লাগে। এভাবে প্রিয়ভাষিণী আলাদা হয়ে ওঠেন- এভাবে তাঁর রূপকল্পের বিস্তার ঘটে- এভাবে তাঁর শিল্পভুবনের যাবতীয় নিশ্চারণ বস্তু প্রাণ লাভ করে।”

অনেকেই তাঁর কাজকে আখ্যায়িত করেছেন ‘জৈব ভাস্কর্য’ (organic sculpture)। বলে মনে হয় সমালোচক বলতে চেয়েছেন যে প্রিয়ভাষিণীর ভাস্কর্যে রয়েছে জীবনের ছোঁয়া, ঠিক জীবে যেমন থাকে প্রাণের স্পন্দন।

আমি তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, ‘শুনেছি আহমেদ সাহেব বেশ শিল্প ও সাহিত্যবোন্দা মানুষ। আপনার শিল্পের মূল্যায়ন তাঁর কাছে কেমন?’

‘আমার শিল্পকর্মের প্রতি রয়েছে শ্রদ্ধাবোধ ও অনুরাগ। তিনি প্রকৃত শিল্পবোন্দার মত আমার প্রতিটি শিল্পকে পর্যবেক্ষণ করেন ও ভালবাসেন।’ একই প্রশ্ন আহসান সাহেবকে করায় তিনি স্বল্প কথায় বললেন, ‘চমৎকার। আমি ওর জন্য গর্ববোধ করি, আই অ্যাম প্রাউড অফ হার, শুধু শিল্পী হিসেবে নয় মানুষ হিসেবেও।

আমি তাঁকে আরও জিজ্ঞেস করেছিলাম ‘সমালোচকদের এ ধরণের মূল্যায়নে আপনি কি খুশী?’ উত্তরে বললেন, সমালোচক বা সাধারণ দর্শক এক এক জন একেক দৃষ্টিতে শিল্পীর কাজকে দেখেন, অনুভব করেন নিজস্ব শৈলীক চেতনা থেকে তার সাথে শিল্পীর মনোভাবনার মিল নাও থাকতে পারে। কিন্তু তাকে মেনে নিতে হয়।’ আমাকে পাল্টা জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি তাঁর কর্মকে কী ভাবে দেখি? আমি ছোট একটি বাক্যে বলেছিলো ‘আমাকে মৃত হইতে অমৃতে লইয়া যাও, অঙ্ককার থেকে আলোতে লইয়া যাও অচেতন লোক থেকে চৈতন্যলোকে লইয়া যাও - এই হলো আপনার শিল্প সাধনা।’ স্মিত হাস্যে প্রিয়ভাষিণী বলেছেন আপনি আমাকে স্নেহ করেন বলেই অত বড় করে দেখছেন আমাকে ও আমার শিল্পকে, আমি অত বড় নই। আমি সামান্য রমণী।

বর্ণনায় তো শিল্পীর কাজ বোঝা যাবে না, রসাস্বাদন করাও যাবে না। এর সৌন্দর্য ভোগ করতে হলে তাঁর কাজ দেখতে হবে, একবার নয় বাবার।

ছোটবেলার কথা

এবার প্রসঙ্গ পাল্টালাম। জানতে চাইলাম তার ছোটবেলার কথা। জানালেন জন্মেছেন খুলনা শহরে মাতামহ বা নানার বাড়িতে ১৯৪৭’এ ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭ সাল (৬ই ফাল্গুন, ১৩৪৫)। নানা ছিলেন শহরের খ্যাতনামা উকিল আবদুল

হাকিম; ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট আমলে পূর্ববাংলা আইন সভার স্পিকার ছিলেন। নানার খুব আদরের ছিলেন - প্রিয়ভাষিণী নামটি তাঁরই দেয়া। এ সময় ঢাকায় শিশু ফেরদৌসী পড়াশুনা শুরু করেছেন মাত্র - সিদ্ধেশ্বরী স্কুলে। হেডমিস্ট্রেস ছিলেন জাহনারা ইমাম। কিন্তু স্বল্প কিছুদিনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার পতন ঘটলে, নানার সাথে ফেরদৌসীও ফিরে আসে খুলনায়।

বাবা সৈয়দ মাহবুব হক প্রথম জীবনে বুলবুল চৌধুরীর সাথে নাচতেন। কিন্তু বুলবুল চৌধুরীর মৃত্যুর পর শিল্পের জগৎ থেকে সরে এসে প্রবেশ করেছেন শিক্ষার জগতে। প্রথমে যশোরের মধুসূদন কলেজ ও দৌলতপুর বি এল কলেজ মিলিয়ে দীর্ঘ ৩৫ বছর অধ্যাপনা করেছেন। কিন্তু পারিবারিক জীবনে তাঁর ছিল সৈয়দী ঐতিহ্যের অহংকার; ফলে পিত্রালয়ে এক ধরনের রক্ষণশীল পরিবেশে শিশু ফেরদৌসীকে বড় হতে হয়েছিল। মা রওশন হাসিনাকে সেজন্য অনেক গঞ্জনা, এমনকি শারীরিক লাঞ্ছনিক সহিতে হত। মা পরবর্তী জীবনে রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েছিলেন - হয়েছিলেন যশোর মহিলা আওয়ামী লীগ শাখার সাধারণ সম্পাদক। শিশু ফেরদৌসীকেও পিতার কড়া শাসনের মুখোমুখী হতে হয়েছিল। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে প্রিয়ভাষিণী রোমান্স করেছেন সে সব দিনের কথা-কেমন করে তার মন সে সময় পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত। এক সময় কিশোরী ফেরদৌসী যখন খুলনায় ৭ম শ্রেণীতে পড়ত, হঠাৎ করে রক্ষণশীল বাবা ফেরদৌসীর পড়াশুনা বন্ধ করে দেন। গোপনে নিজের গয়না বিক্রী করে বা বন্ধক রেখে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে মনস্ত করে, পিতার আদেশের বিরুদ্ধে। অবশেষে নানার হস্তক্ষেপে সমস্যার সমাধান হয় সাময়িকভাবে। এর পরপরই পিতা চলে গিয়েছিলেন যশোরে। ফেরদৌসী মাতা ও পিতা উভয়ের পক্ষ থেকেই পেয়েছিলেন একটি শিল্পী মন। শত কষ্ট ও গঞ্জনার মধ্যেও সঙ্গীত ও সকুমার শিল্প চর্চা করেছেন।

এভাবেই ফেরদৌসী ম্যাট্রিক পাশ করলেন সন্তুষ্ট ১৯৬২ সালে। ইতোমধ্যে একটি ছেলের সাথে ফেরদৌসীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে - পাড়ার বাখাটে নামে খ্যাত ছেলেটির মধ্যে ছিল শিল্পগুণ- ভাল গান গাইত আর ছবি আঁকত, কিন্তু পড়াশুনা বিশেষ করেনি। পরিবারের কুকু পরিবেশ থেকে মুক্তির আশায় এবং একজনকে আশ্রয় করে জীবনকে গড়ে তুলতে ফেরদৌসী ১৯৬৩ সালে ঐ ছেলেটিকে বিয়ে করেন। শুরু হল ফেরদৌসীর জীবন সংগ্রাম - পরিবার পরিজন ছেড়ে বেছে নিলেন একা চলার পথ। কঠিন সে সংগ্রাম। আবিষ্কার করল বিয়ের রাতেই স্বামীর শিল্পী মনের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা রক্ষণশীল কর্তৃত্বময় আসল মনোভাব। ঐ রাতে স্বামীর কাছ থেকে উপহার পেলেন একটি প্যাকেট যার মধ্যে ছিল এক জোড়া কালো বোরখা। স্বামীর নির্দেশ এল

‘এখন থেকে এই বোরখা পড়েই তোমাকে বাইরে যাতায়াত করতে হবে’। স্মৃতি রোমান্স করে প্রিয়ভাষিণী আমাকে বললেন, ‘হতভুব হলেও, আমি ঘৃণাভরে তার সে উপহার ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, প্রত্যাখ্যান করলাম তার নির্দেশও’।

### সংগ্রামী জীবনের ১ম অধ্যায়

স্কুলে চাকুরী নিলেন ফেরদৌসী। আবিষ্কার করলেন স্বামী ম্যাট্রিকও পাশ করে নি। ধৈর্যশীলা প্রিয়ভাষিণী জীবনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন - স্বামীকে ম্যাট্রিক পাশ করিয়ে পলিটেকনিকে ভর্তি করালেন, স্বামীর পড়াশুনার খরচ চালিয়ে যেতে থাকলেন। এই জীবন সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই ১৯৬৭ সালের ভেতরই তিনি সন্তানের জননী হলেন। এরই মধ্যে আবিষ্কার করলেন যে স্বামী প্রায়শ কলেজ ফাঁকি দিয়ে নানা আড়তায় আসের জমায়। ১৯৬৯ সালে প্রিয়ভাষিণীর সুখে দুঃখের সাথী মাতামহ মৃত্যু বরণ করেন। আরও দিশেহারা হয়ে পড়েন ফেরদৌসী। স্বল্প আয়ে তিনি সন্তান সহ সংসার চালানো কষ্টকর হয়ে উঠল, ইতোমধ্যে ফেরদৌসীর চেষ্টাতেই স্বামীকে অনেক কষ্টে পলিটেকনিক ডিপ্লোমা পাশ করালেন। চাকরীও পেল স্বামী। বখাটে স্বামীর আয় ফেরদৌসী কখনও পান নি। ১৯৬৫ সালে শুভানুধ্যায়ীদের চেষ্টায় খুলনা পিপলস জুট মিলে টেলিফোন অপারেটরের চাকরী পেলেন, মাইনে কিছু বাড়ল। এই মিলের একজন বড় কর্মকর্তা ছিলেন আহমেদ রেজা, নাট্যশিল্পী রিনি রেজার বাবা।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে বড় মামার সাথে চালাতেন সাংস্কৃতিক চর্চা- অংশ নিয়েছেন নানা অনুষ্ঠানে। এমনি করেই খুলনার শিল্পজগতে প্রিয়ভাষিণী ক্রমশ হয়ে ওঠেন একটি পরিচিত নাম। কয়েক বছর চাকুরীর পর ফেরদৌসী ১৯৬৫ সালে প্লাটিনাম জুট মিলে টেলিফোন অপারেটর ও যোগাযোগ বিষয়ক সকল বিষয়ের দায়িত্ব নিয়ে চাকরী নেন ২৫০/- মাসিক বেতনে। আর্থিক সচ্ছলতা কিছু এল, যদিও সংসারের চাহিদার তুলনায় যৎসামান্য। এখানেই সহকর্মী অফিসার আহসান উল্লাহ আহমদ সাহেবের সাথে পরিচিত হন। আহমদ সাহেব ছিলেন ফেরদৌসীর তাৎক্ষণিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা- তাঁর কাছেই রিপোর্ট করতে হত প্রতিদিন। প্রথম দর্শনেই সুপুরুষ হিসেবে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও, তাঁকে মনে হত অহংকারী দাঙ্গিক ও কেতাদুরস্ত মানুষ হিসেবে। তবে এই পরিচিতি ক্রমশ পরম্পরাকে কাছে নিয়ে আসে। ফেরদৌসী ক্রমেই আবিষ্কার করলেন যে আহসান উল্লাহ আহমেদের ভেতরে রয়েছে একটি সুন্দর মনের রুচিশীল ও সহানুভূতিময় মানুষ যার কাছে ভরসা নিয়ে দাঁড়ান যায়। ২-৩ বছর পর আহমদ সাহেব অন্য একটি কোম্পানিতে চাকরী নিয়ে চলে যান, তবে যোগাযোগ অব্যাহত ছিল।

## সংগ্রামী জীবনের ২য় অধ্যায় : একান্তরের দুঃসহ স্মৃতি

এর মধ্যদিয়েই এল ১৯৬৯ এর গণ আন্দোলন যার টেউ খুলনা শহরেও আছড়ে পড়েছিল। সংসারের ঘাতাকলে নিষ্পিষ্ঠ ফেরদৌসীর অবকাশ ছিল না এসব আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেবার, যদিও সহকর্মীরা হরতাল বা স্ট্রাইক করলে তিনি তা পালন করতে পেছপা হতেন না। এরই মধ্যে সংসারের অর্থকষ্ট ছাড়াও স্বামীর সন্দেহভাজন মন আর শারীরিক অত্যাচারের মাত্রা অসহনীয় পর্যায়ে পৌছালে স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটান ১৯৭০ সালে। ছেলেদের নিয়ে স্বামী চলে গেলেন, পেছনে পড়ে রইলেন ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী একা নিঃসঙ্গ।

প্রিয় সুস্বদ সমব্যথী আহসান উল্লাহ আসেন মাঝে মধ্যে, সামাজিকতার আরষ্টার বাধা সত্ত্বেও, ভরসা দেন, সাহয়ের হাত বাড়িয়ে দেন - যা ফেরদৌসীর মনকে ছুঁয়ে যায়, সংগ্রামে বাঁচতে উদ্বৃদ্ধ করে। ফেরদৌসীর মনে আছে এমনি দিনে হঠাৎ করেই আহমেদ সাহেব ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীকে চায়ের নেমত্ত্ব করেন নিজ বাসায়। অস্পষ্টি বোধ করেন প্রিয়ভাষিণী, কিন্তু ভাল লাগে- গ্রহণ করেন নেমত্ত্ব। এ ভাবেই পরিচয় ত্রুটি গাঢ়তর হতে থাকে। ভাললাগা ক্রমেই ভালবাসার রূপ পায়। কিন্তু সঙ্কোচ থেকেই যায়।

এর মধ্য দিয়েই এল ১৯৭১'এ শেখের ডাকে 'অসহযোগ আন্দোলন'। ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ খুলনাবাসী আর সকলের মত ফেরদৌসীকে উদ্দীপ্ত করে। অফিসের কাজকর্ম প্রায় বন্ধ, তবুও ফেরদৌসী কাজে যান নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য - টেলিফোন অপারেটরের দায়িত্ব যে অসীম। ২৩শে মার্চ বেতন পেলেন। ইতোমধ্যেই মা যশোর থেকে চলে এসেছেন ফেরদৌসীর বাসায়। বেঁধে গেছে বিহারী-বাঙালী দাঙা- বিহারীরাই আক্রমণাত্মক। ২৫শে মার্চের করাল রাত খুলনাবাসীও প্রত্যক্ষ করল- বাঙালীদের ওপর বিহারীদের নৃশংসতা বেড়েই চলল- পশ্চাতে রয়েছে পাক-আর্মির প্রত্যক্ষ সমর্থন। দাঙার হাত থেকে বাঁচতে সকলে চলে এল পাবলা গ্রামের বাড়ীতে মাকে নিয়ে ২৭- ২৮শে মার্চ তারিখে। সেখানেও থাকা নিরাপদ নয় ভেবে খুলনায় চলে এলেন নানার বাসায় আশ্রয়ের জন্য। কিন্তু সে বাসায় তিল ধারণের স্থান নেই। কয়েকদিন পরে ফিরে গেলেন নিজের বাসায় খালিসপুরে মাকে সহ। ইতোমধ্যে বাসার



সবকিছু লুটপাট হয়ে গেছে। বাঙালী হত্যার নির্মম নির্দশন করলেন প্রত্যক্ষভাবে- পথের পাশে লাশ আর লাশ। যাওয়ার পথে মুস্তীবাড়ীর খোলা প্রাঙ্গণে পড়ে রয়েছে নিথর সাধারণ মানুষের মৃতদেহ সারি সারি।

খালিশপুরেও থাকা হল না বিহারী আর মিলিটারিদের অত্যাচারে। আবারও পালালেন গোয়ালখালি গ্রামে; এক সম্মত কৃষক পরিবারে আশ্রয়ের আশায় উঠলেন। স্থান পেলেন গোয়ালখালি। পরিবারের কর্তা স্পষ্ট জানালেন যে তিনি মুসলিম লীগের সমর্থক - কাজেই ইপিআর বাহিনীর আক্রমণের লক্ষ্য হতে পারেন। সে ক্ষেত্রে ফেরদৌসীরা নিরাপদ নন। এ অবস্থায় ১০-১২ই এপ্রিলে মাকে যশোরে পাঠিয়ে দিলেন- যা কিছু ছিল বেশীরভাগই মাকে দিয়ে দিলেন। মাকে বিদায় দিয়ে ফেরদৌসী রাস্তায় নেমে এলেন আশ্রয়ের সন্ধানে। পথেই হঠাৎ করেই দেখা হল আহসান সাহেবের সাথে- নিয়ে গেলেন শহরের প্রান্তে এক বাসায়। বাড়ীর কর্তা হক সাহেব আমুদে মানুষ- বহু আশ্রয়হীন পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছেন, সব খরচ বহন করছেন অক্লেশে। এ কাজের জন্য বিহারীরা তাকে ক্ষমা করে নি, নৃশংসভাবে হত্যা করেছে- পরে ফেরদৌসী জেনেছিলেন।

পরদিন সকালে আহসান সাহেব বিদায় নেবার আগে ফেরদৌসীকে জানালেন যে তিনি বাঙালীদের ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার জন্য ইতোমধ্যেই বিহারী ও আর্মির নজরে পড়েছেন। নিজের জীবনই ছমকির সম্মুখীন 'তবুও তোমার নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষা করা আমার দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। কিছুদিনের মধ্যেই আমি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাব।' ফেরদৌসীর তখন একমাত্র চিন্তা সহায় সম্বলহীন নিঃস্ব চাকুরীছারা এই বৈরী পরিবেশে বাঁচবেন কি করে? বিপদ জেনেও রাস্তায় বের হলেন একদিন প্রিয়ভাষিণী। পথে দেখা হল ক্রিসেন্ট জুট মিলের অবাঙালী অফিসার জাহাঙ্গীরের সাথে। মাস ছয়েক আগে ফেরদৌসী এই মিলে যোগ দিয়েছিলেন সামান্য বেশী মাইনায়। জাহাঙ্গীর অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন 'তুমি এখানে?' পালাও নি?' ফেরদৌসী না বলায়, জাহাঙ্গীর জানতে চাইল সে পুনরায় মিলে ফিরে আসতে চায় কিনা? বিধ্বস্ত কপর্দকহীন অসহায় ফেরদৌসীর মনে পুনরায় বাঁচার ঝিলিক দেখা দেয়, অক্লেশে রাজী হয়ে যান। জাহাঙ্গীর তাঁকে রিকসায় করে অফিসের একটি নির্জন বাসায় নিয়ে এল-

জানাল যে তাকে এখন থেকে এখানেই থাকতে হবে, সন্দেশবেলায় আর্মি অফিসারেরা আসবে তাদের মনোরঞ্জন করাই হবে তোমার আসল চাকুরী। দিনে মিলে আগে যা করতে তাই করবে।' শিউরে উঠলেন ফেরদৌসী। কি করবেন, কোথায় যাবেন? সুন্দর আহমেদ সাহেবেও কাছে নেই যে পরামর্শ করা যাবে। ঐ মানুষটিকে যে তার বড় প্রয়োজন। বলে ছিলেন 'তোমাকে নিয়ে যাব নিরাপদ আশ্রয়ে' একথা বারবার স্মরণ করে অভিমানে ফুঁসে উঠেছেন প্রিয়ভাষিণী। শুধু জানতেন এ বাসায় থাকা চলবে না। হতবিহ্বল ফেরদৌসী বেরিয়ে পড়লেন, গেটে বিহারী দারোয়ান আটকালো 'বাহির যানা মানা হৈ', বললেন, 'এক্ষুণি আসছি, কাপড়চোপড় তো আনিনি, নিয়েই ফিরে আসব।' রিকাসায় করে দ্রুত চলে এলেন অফিসে এম.ডি ফিদা সাহেবের চেম্বারে। এম.ডি অবাক, 'তোম ? ইত্তিয়া যাও নি, মুক্তিতে নাহি গিয়া ?' অন্যেরা সাক্ষ্য দিল 'সি ইজ ইনোসেন্ট। লেট আস ইউজ হার ফর আওয়ার পারপাজ।' এম.ডি তাকে কাজে যোগ দিতে বললেন আর একাউন্ট অফিসার নাজির সাহেবকে নির্দেশ দিলেন ওকে ৩০০ টাকা দেবার- কাপড় চোপর আর প্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনার জন্য। নাজির সাহেব কড়া নির্দেশ দিলেন বাসস্থানের ঠিকানা জানাতে যাতে পরদিন তাকে আনতে গাড়ী যেতে পারে। ফেরদৌসী কায়দা করে বাসস্থানের ঠিকানা না দিয়ে গাড়ীকে কোথায় দাঁড়াতে হবে সে ঠিকানা জানালেন, বললেন তিনি যেখানে থাকেন সেখানে গাড়ী ঢোকে না। ফেরদৌসীর ইচ্ছে ছিল আগের বিহারীদের মধ্যে তার খালিশপুরের ফ্লাটে না থেকে পাবলা গ্রামে জনৈক পরিচিত দারোগার বাসায় থাকবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবস্থার চাপে সেখানে আর যেতে পারেন নি তিনি।

পরদিন ১৮ই এপ্রিলে অফিসে যোগ দিলেন। প্রিয়ভাষিণীর তিক্ততম জীবন অধ্যায়ের সূত্রপাত হল। সেদিনই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন 'সেই আগের সম্মানিতা ফেরদৌসী আর তিনি নেই' - বিহারী অধস্তুন কর্মচারীরাও তাকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছে। তাদের দৃষ্টিতে ফেরদৌসী এখন লালসা চরিতার্থের দ্রব্য, মানুষ প্রিয়ভাষিণীর মৃত্যু ঘটেছে মিল কর্তৃপক্ষ আর কর্মচারীদের মানদণ্ডে। সেদিনই সকাল ১১টার দিকে দীর্ঘদিনের অব্যবহৃত পিএবিএক্স যন্ত্রপাতি সংযোজন ইত্যাদি পুনর্সংজ্ঞিত করায় যখন তিনি ব্যস্ত, এক পাঞ্জাবী ছোট কর্মচারী, যারা আগে চোখ তুলে কথা বলতে সাহস করত না, তাকে হঠাতে করে জড়িয়ে ধরে অশ্বীল কথাবার্তা ও কুপ্রস্তাব দিতে শুরু করল। অনেক কষ্টে তিনি তার আক্রমণ থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন। কিন্তু নাছোড়বান্দা হুমকি দিল যে সে আবার আসবে। নানা দিক থেকে আক্রমণ আসতে থাকল। এম.ডি ফিদা একদিন ডেকে পাঠালেন চেম্বারে, কেউ নেই 'আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে থাকলেন, বললেন লাঞ্ছে যেতে।' একদিন নাজির সাহেব কাজের ছুতায় আমাকে নিয়ে বের হলেন- যথারীতি মনোরঞ্জনের জন্যে। অফিসে ফিরে

এলে ফিদা সাহেব জানতে চাইলেন 'আমি অফিসের বাইরে কোথায় ছিলাম?' নাজির সাহেবের কথা বলায়, মুচকি হাসলেন অশ্বীলতার ঈঙ্গিত চোখে মুখে। লজ্জায় ঘৃণায় মাটির সাথে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু পুনরায় আমার বাঁচার তাগিদ আমাকে স্থিতধি করল, শপথ নিলেন 'আমাকে বাঁচতেই হবে, এ যুদ্ধে পরাজিত হলে চলবে না।' ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফিদা সাহেব স্পষ্টভাবে জানালেন যে তাঁকে একটি পৃথক বাসা দেয়া হচ্ছে, এখন থেকে মিলের ভেতরেই থাকতে হবে মিলের বাংলোতে। বাইরে থাকা চলবে না। নিষ্ঠুর ভাষায় তিনি ফেরদৌসীকে নির্দেশ দিলেন প্রতি রাত্রে তার বাসায় বসবে গানবাজনার আমোদফূর্তির আসর- সেখানে বড় বড় আর্মি অফিসারেরা আসবেন। এদের মনোরঞ্জনের প্রধান দায়িত্বে থাকতে হবে ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী নামের একটি বাঙালী মেয়েকে।

খাচার পাখী এবার শক্ত খাচায় বন্দী হলেন। বাইরে থাকায় যে সামান্য স্বাধীনতাটুকু ছিল তাও তিরোহিত হল। মনের দুঃখে ক্ষেত্রে কেবলই মনে হতে থাকল আহসান উল্লাহ সাহেবের কথা - কেবল মাত্র তিনিই পারেন তাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে। কিন্তু স্বপ্নের রাজপুত্র স্বপ্নেই রয়ে গেল। প্রায় ৯মাস এই বন্দী দশাতেই কাটল ফেরদৌসীর এক দুঃসহ জীবন, যন্ত্রণার জীবন, ক্লেদের জীবন। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল আশে পাশে বাঙালী হত্যার প্রত্যক্ষদর্শন, নারী নির্যাতন আর ধর্মণের লোমহর্ষক চিত্র। এই বন্দী জীবনে নানা স্তরের আর্মি ও নেতাল অফিসারকে সঙ্গ দিতে হয়েছে- সে কাহিনী লজ্জাজনক শুধু ব্যক্তি ফেরদৌসীর জন্য নয় আমাদের সকলের লজ্জা। আর ফেরদৌসী তো একা নন হাজার হাজার ফেরদৌসীকে নিজের লজ্জাকে বিসর্জন দিতে হয়েছে স্বাধীনতার মূল্য হিসেবে। প্রিয়ভাষিণী এ জীবনকে ঘৃণা করেছেন- লজ্জায় অনুশোচনায় অনেক বার আত্মাত্বা হতে চেয়েছেন, পালাতে চেয়েছেন। কিন্তু পারেন নি নিজ তিনি শিশু সন্তানদের কথা আর ছোট ভাইগুলোর কথা ভেবে, যারা তার উপার্জনের ওপর সর্বতোভাবে তখন নির্ভরশীল। নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছেন 'এ আমার, আমার মত করে স্বাধীনতার যুদ্ধ, মুক্তির লড়াই' - যে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে একদিন আসবে বাংলার স্বাধীনতা, জন্ম নেবে মোহন লালের বাংলা, মীরমদনের বাংলা, সিরাজের বাংলা। নতুন করে আশায় বুক বেঁধেছেন ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী।

এরই মধ্যে ওপর থেকে নির্দেশ এল তাঁকে যশোর পাক আর্মি ক্যান্টনমেন্টে যেতে হবে, উদ্দেশ্য একই তাকে নেয়া হল আর্মি অফিসারদের মনোরঞ্জনের জন্য। জনৈক সামরিক কর্তা কোরবান ও অন্য দুজন অফিসার এসকোর্ট করে নিয়ে গেল- পথেই ঐ অফিসারেরা তাকে ধর্মণ করতে পেছপা হয় নি; এমন কি ক্যান্টনমেন্টে কর্নেল খটকের হাতে হস্তান্তরের আগেও বিলিয়ার্ড রুমে তার ইজ্জৎ নিয়ে খেলা করেছে তারা। সেখানে ২৮ ঘন্টা তিনি সংজ্ঞাহীন ও অর্ধচেতন অবস্থায়

ছিলেন। কখন ডাঙ্গার এসেছে চিকিৎসা করেছে তার মনে নেই। এ সময়ের কথা রোমান্টিন করে প্রিয়ভাষিণী আজও শিউরে উঠেছেন, নিজের দেহকে মনে করেছেন অপবিত্র, গলিত লাশ হিসেবে: “আমি সে সময় খালিশপুরের যে বাসায় ছিলাম তার কাছে কবরস্থানে বাঙালীদের হত্যা করে লাশ ফেলে রাখতে দেখেছিলাম। সেই সৎকারহীন লাশ গলে পচে যেতে দেখেছি। নিজের নিষ্পেষিত দেহকে আর নিজের মনে হত না। গলিত লাশ বলে নিজেকে মনে হত।” বেশ কিছুদিন পরে তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনা হল খুলনায় মিল অফিসে। এ সময়টায় তাকে বারবার হৃষকি দেয়া হয়েছে যে সে যদি সেনা বাহিনীর সাথে সহযোগিতা না করে, তাহলে মুক্তিযুদ্ধে তার ভাইরা যোগ দিয়েছে এবং সেও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করছে এই অভিযোগে তার বিচার করা হবে। এমনও অভিযোগ আনা হয়েছে যে খুলনার পিস কমিটির সদস্য এক অধ্যাপকের হত্যাকাণ্ডের সাথে তিনি জড়িত। ফিদা সাহেব হৃষকি দিয়েছেন তাঁর কথা না শুনলে তাকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হবে, যেখানে তাকে সাধারণ সৈনিকরা ছিঁড়ে থাবে, ‘আর সেখান থেকে থ্রাণ নিয়ে কেউ ফিরে আসে না।’ একটি কথায় এ প্রসঙ্গ শেষ করি বন্দী জীবনে জুনিয়র থেকে সিনিয়র অফিসার কারও হাত থেকে এই বীরকন্যা রেহাই পান নি। এরই অনিবার্য পরিণতি হিসেবে টের পেলেন তার গর্ভে ‘পাকিস্তানী পশ্চদের বিষাক্ত জীবনের স্পন্দন’। গোপনে জনৈক ডাঙ্গারের সহায়তায় গর্ভপাত ঘটালেন এই অসীম সাহসী নারী। এর মধ্যে মাত্র দু’এক জন পাকিস্তানী সহস্য অফিসারের সাক্ষাৎ পেয়েছেন যারা সেই দুর্ঘাগের দিনে যতটা সম্ভব তাকে সাহায্য করেছিলেন। এমনি দু’জন অফিসারের কথা ফেরদৌসী ভুলে যান নি- মেজর আলতাফ করিম এবং মেজর একরাম। নির্যাতিতা ফেরদৌসীকে এই অসহায় অবস্থা থেকে উদ্ধার করার মানসে মেজর আলতাফ তাকে বিয়ে করে পাকিস্তানে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন স্ত্রীর মর্যাদায়। আর মেজর একরাম ফেরদৌসীর অনুরোধে পরিচিত একজন বন্দী মুক্তি যোদ্ধাকে ছেড়ে দেয়।

এর মধ্য দিয়েই এল অবশেষে মুক্তি। ইতোমধ্যে যশোর ক্যান্টনমেন্টের পতন ঘটেছে। সে সময় নানা জনে তাকে জানাতে থাকল যে তাকে মারার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে- সবাই উপদেশ দিচ্ছে মিল এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেতে। অবশেষে এল সেই আকাঙ্ক্ষিত ফোন আহসান উল্লাহ সাহেবের। দ্রুত নির্দেশ দিলেন তৎক্ষণাত তার জে জে মিলে চলে যেতে। দিনটি ছিল ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৭১। গেটেই দেখা হল আহসান উল্লাহ’র সাথে- অভিমানে, বেদনায়, দুঃখে এতদিনের অশ্রু বাঁধভাঙ্গা স্নোতের মত নেমে এল। আহসান উল্লাহ জড়িয়ে ধরলেন, অভয় দিলেন। রাগে দুঃখে ফেরদৌসী ছুটে বেরিয়ে ফিরে এলেন আবার সেই বাংলোয় প্রচণ্ড অভিমান নিয়ে। ৬ই ডিসেম্বর বেরিয়ে পড়লেন সামান্য কিছু সম্বল আর হাতব্যাগটা নিয়ে। বেবী ট্যাঙ্কী করে দ্রুত চলে এলেন জে জে জুট মিলে

আহসানের উদ্দেশে, সন্ক্ষেবেলা। জে জে জুট মিলের জি এম ইন্দ্রিস সাহেবকে যশোর থেকে জানান হয়েছে যে যশোরের পতন ঘটেছে- এই প্রেক্ষিতে তিনি যেন মিল এলাকা ছেড়ে অবাঙালী অফিসারদের নিয়ে খুলনায় চলে যান। ইন্দ্রিস সাহেব নির্দেশ মানলেন তবে সবটা নয়, বাঙালী অবাঙালী সবাইকে নিয়ে চলে এলেন খুলনার সেলিম হোটেলে। ফেরদৌসীও আহসান সাহেবের সাথে এই হোটেলে স্থান পেলেন। আর এ কারণেই অবাঙালী হয়েও ইন্দ্রিস সাহেব বাঙালীদের মধ্যে ছিলেন বেশ জনপ্রিয়। অবশেষে সত্যিই মুক্তি এল ১৬ই ডিসেম্বর, এল সেই স্বাধীনতা যার জন্য ৯ মাস ধরে লড়াই করলেন এক দুঃসহ যুদ্ধ। পরদিনই দেখে এলেন বৈরব নদীর পারে গল্লামারীর বধ্যভূমি।

আহসান উল্লাহ আহমেদ সব শুনলেন ফেরদৌসীর বন্দী জীবনের অকপট কথা। সন্তোষে অপার সমবেদনায় সেদিন আহমেদ সাহেব বলে ছিলেন, “তুমি অনেক মুক্তি যোদ্ধার চাইতে অনেক বড়, অনেকের থেকে অনেক মহান। পাকিস্তানীরা যা করেছে তা ভুলে যাও, মনে কর এটি মুক্তি যুদ্ধেরই একটি দিক। এ নিয়ে বিন্দু মাত্র ভেবে না। আমার কাছে তুমি আগেও যেমন ছিলে, ঠিক তেমনিই আছ।” এই আবেগই ফেরদৌসীকে নতুন করে পথ চলার শক্তি জুগিয়েছে, নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করেছেন আর তার মধ্য দিয়ে দেশকে চিনতে চেয়েছেন নিবিড় ভাবে। ১৯৭২ সালে উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। শুরু হল প্রিয়ভাষিণীর নতুন করে পথ চলা, নতুন এক জীবনের সন্ধানে।

### বাংলার মেয়ে প্রিয়ভাষিণী

দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় প্রিয়ভাষিণী অনেক বড় বড় মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছেন - পরিচিত হয়েছেন অনেকের সাথে। এর মধ্যে বোধহয় বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ চিন্তাবিদ অম্বান দত্তের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। “আমি অম্বান দত্তকে চিনি ওর লেখার মাধ্যমে। দেশে লেখা ওর প্রবন্ধ আমাকে আকৃষ্ট করত। মনে হত কত পণ্ডিত আর উচ্চদরের মানুষ। আমার একটা অভ্যেস বরাবরই ছিল ‘বড় মানুষকে’ চিঠি লেখা। কখনও উত্তর পাই কখনও পাই নি। ইচ্ছে হল তাঁকে চিঠি লেখার।

সেই ইচ্ছেরই প্রতিফলন ঘটল ১৩৯৪ সালে ১৫ই আষাঢ় (২৯শে জুন ১৯৮৭) তারিখে প্রিয়ভাষিণী অম্বান দত্তকে যশোর থেকে একটি চিঠি লিখলেন। প্রিয়ভাষিণী তখন স্বামীর সাথে যশোর থেকে আঠারো মাইল দূরে মহাকাল গ্রামে স্বামীর চাকুরী সূত্রে অবস্থান করছিলেন। চিঠির আরম্ভটা ছিল এ রকম :

“শ্রদ্ধাস্পদেষু, আমার পরমায়ুরূপ শ্রদ্ধা রইল। আপনাকে কখনো দেখিনি। কিন্তু শুনেছি প্রচুর আপনার সম্পর্কে। কিছুদিন আগে বাংলাদেশে আপনি একবার এসেছিলেন। আমার প্রবল ইচ্ছে ছিল আপনার সাথে দেখা করার। কিন্তু এই শত তুচ্ছের আড়ালে পড়ে থাকা, নামগোত্রহীন জীবনযাপনে

আপনার দর্শন কামনা শুধুমাত্র ইচ্ছে হিসেবেই বেঁচে আছে। আমি বাংলাদেশের গ্রামের মধ্যে বাস করি। যশোরের থেকে আঠারো মাইল উপকর্ত্ত্বে। ... ” চিঠিতে বিষয়ী কথা একটাই ছিল তাঁর কিশোরী মেয়েদের শান্তিনিকেতনে পড়ানোর ব্যাপারে অধ্যাপক দত্ত কোন কিছু করতে পারেন কিনা। এই অনুরোধের পেছনে সর্কুল চিত্তে কারণ উল্লেখ করেছেন প্রিয়ভাষিণী ‘শিশুদের বাপসা ভবিষ্যৎ আমাকে উদ্বিগ্ন করেছে।’ নিজের সম্পর্কে লিখেছেন, “আমার কিছু প্রিয় সখ আছে, যা দিয়ে আমি অবসরে কাজ করে সময় কাটাই। কাঠের বা গাছের গুঁড়ির উপরে ভাস্কর্য কাজ। অতি প্রাচীন গাছে শিকড়ের মাঝে রূপকথা খুঁজে পাই। ...”

অতি দ্রুতই জবাব পেলেন তিনি অম্বান দত্তের কাছ থেকে। ১৯৮৭ সালের ৪ঠা জুলাইতে অম্বান দত্ত লিখলেন:

“সুচরিতাসু, আপনার সহন্দয় পত্র মনকে স্পর্শ করে। আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। চিঠির ভেতর দিয়েই দূরত্ব পেরিয়ে আপনি নিকট হলেন।”

এর পর শান্তিনিকেতনে মেয়েদের ভর্তির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যোগাযোগের ঠিকানা দিয়েছেন। চিঠিটি শেষ করেছেন এভাবে :

“আমি ক'দিন পরই সন্তুষ্ট  
বেনারস চলে যাব। জানিনা  
আপনার সঙ্গে কখনো দেখা হবে  
কি না। .. সকলের জন্য শুভ  
কামনা রাইল।”

এই পত্রালাপ ক্রমশ দীর্ঘ হয়েছে। অবশেষে এই সম্পর্ক পরিণত হয়েছে বন্ধুত্বে। সম্মোধন ‘আপনি’ থেকে ‘তুমিতে’ এসে নেমেছে। কিন্তু দীর্ঘ সাত বছরও দুজনের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটে নি। অবশেষে সাক্ষাৎ ঘটল ১৯৯৩ সালে - বোলপুর রেল স্টেশনে, সেও কেবল চকিতের দেখা চোখে। প্রিয়ভাষিণী স্টেশনে নেমেছেন অৱ র অম্বান দত্ত তখনই ফিরতি ট্রেনে কোলকাতা প্রত্যাবর্তনমুখী। জানালায় বসা অম্বান দত্তকে দেখামাত্র ট্রেন ছেড়ে দিল। তবে ফিরতি পথে কোলকাতায় অম্বান দত্তের কোলকাতার বাসায় স্লট লেকে বাসায় রাইলেন দিনকয়েক। সাক্ষাতের আগের একটি চিঠিতে অম্বান দত্ত জানাচ্ছেন:

CB 110, Salt Lake  
Calcutta

প্রিয় ফেরদৌসী,

তুমি আসছ, যাকে বন্ধু বলে জানি তবু চোখে দেখিনি, তাকে দেখা হবে, এই বার্তা বহন করে তোমার চিঠি এল। তারপর থেকে তোমার আসার আশায় আছি। কিন্তু কবে আসবে তা তো এখনো জানি না। হয়তো আগে থেকে চিঠিতে

জানাবার সময়ও তোমার হবে না। আমার টেলিফোন নম্বর, দেওয়া রাইল, ৩৭১৮৩১। সময় মতো ফোন করো। এদিকে আষাঢ়-শ্রাবণ পার হয়ে আমরা ভদ্র মাসে প্রবেশ করেছি। বর্ষার বেগ ক্রমে মন্ত্র হয়ে এসেছে। এখন আকাশের রূপ বদলাচ্ছে, আমরা বর্ষা ও শরতের সন্ধিলগ্নে। আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের একটি শিল্পী মেয়েকে কাছে পাবার জন্য সুন্দর সময়। আমার সোনার বাংলা ... .

প্রীতি ও শুভেচ্ছা

অম্বান

পু : অনেকটা সময় হাতে নিয়ে আসবে।

যে পত্রালাপ শুরু হয়েছিল হঠাৎ করেই তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে যদিও সময়ের ক্লান্তিতে ফ্রিকোয়েল্সি কমে এসেছে। ২০০৫ সালে প্রয়াত মীজানুর রহমান তাঁর পত্রিকায় অম্বান দত্ত-প্রিয়ভাষিণীর কিছু পত্রাবলী প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে ২০০৪ সাল তক মোট ৩৭টি চিঠি স্থান পেয়েছিল- অম্বান দত্তের ৩১টি, প্রিয়ভাষিণীর মোট ৬টি। এই পত্রগুচ্ছই পরবর্তীকালে ২০০৭ সালে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল অম্বান দত্তের উদ্যোগে ‘বাংলার মেয়ে প্রিয়ভাষিণীকে’ শিরোনামে। মীজানুর রহমানের সকলনে উপস্থাপনা ছিল অনেকটা এরকমঃ

প্রাঞ্জলি পাঠক, অম্বান দত্তের পরিচয় দেয়া কি খুবই প্রয়োজন ? একদা কুমিল্লা নিবাসী এবং বর্তমানে ভারত-প্রবাসী প্রখ্যাত এই চিন্তাবিদ ও শিক্ষাব্রতীর মননশীল রচনা বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে এক অমূল্য সংযোজন হিসেবে বিবেচিত একথা সকলের জানা। .. . সমালোচকরা বলেন- অম্বান দত্তের রচনায় একই সঙ্গে মিশে থাকে যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ, দার্শনিক মনন ও হার্দিক সম্মেলন। .. .

প্রিয়ভাষিণী আমাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের এক বহুল পরিচিত নাম। তাঁর কাঠ-খড়, গাছের গুঁড়ি ইত্যাদি সামান্য উপকরণ দিয়ে ভাস্কর্য নির্মাণ কিংবদন্তিতে দাঁড়িয়েছে। .. তাকে লেখা অম্বান দত্তের চিঠিগুলোতে সময় ও চিন্তার ছাপ সুস্পষ্ট। ..

পুনর্মুদ্রিত প্রকাশনায় (জানুয়ারী ২০০৭) অম্বান দত্তের সংকলনে তিনি নিবেদন করেছেন :

ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীকে লেখা এই পত্রসংগ্রহ প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকায় ২০০৪ থেকে ২০০৫ সাল অবধি তিনটি সংখ্যায়। এখন কোলকাতা থেকে একত্রে পুনর্মুদ্রিত হল পুস্তকের আকারে।

প্রিয়ভাষিণীকে লেখা অস্মান দত্তের একটি চিঠি (১০. ০৪. ০৭) দিয়ে পুষ্টাকাকারে এই পত্রসংগ্রহের আরম্ভ। তারপরই আসছে অস্মান দত্তকে লেখা প্রিয়ভাষিণীর পাঁচটি চিঠি। এরপর শুরু হচ্ছে প্রিয়ভাষিণীকে লেখা অস্মান দত্তের চিঠি, যার মোট সংখ্যা ত্রিশ। একেবারে শেষে রাখা হয়েছে প্রিয়ভাষিণীর আরো একটি চিঠি। ... প্রথম ছ'সাত বছর পত্রালাপই চলেছে, প্রিয়ভাষিণীর সঙ্গে অস্মান দত্তের দেখা হয় নি। নয় নম্বর চিঠিতে তার ইঙ্গিত আছে।

আমরা দু'একটি চিঠি এখানে উপহার দিলাম পাঠকদের কৌতুহল নিবৃত্তির লক্ষ্যে। সংকলনে অন্তর্ভুক্ত সর্বশেষ যে চিঠি দিয়ে (১০. ০৪. ০৮) আরম্ভ হয়েছিল তা ছিল এরকম:

CB 110, Salt Lake,  
কলকাতা - ৭০০ ০৬৪  
১০. ৮. ০৮  
Telephone: 2331831

প্রিয়ভাষিণী,

তোমার কথা ভাবছিলাম। কোনো সাড়াশব্দ পাইনি। শুনেছিলাম তোমার ঠিকানা বদলেছে, আর কি তবে যোগাযোগ হবে না। এমন সময় হঠাৎই তোমার চিঠি এলো, হঠাৎ খুশির মতো। হঠাৎ পাওয়া সৌভাগ্যের মতো। জীবনের শেষ পর্বের সৌভাগ্য। এবছর আমার আশি বছর পূর্ণ হচ্ছে। এবার বিদায় নেবার পালা। যাবার আগে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাতে মন চায়। পুরনো স্মৃতি ভীড় করে আসে।

মীজানুর রহমানের পত্রিকায় তোমার ও আমার চিঠি ছাপাবার প্রস্তাব তুমি জানিয়েছ। তোমাকে আমি যে সব চিঠি পাঠিয়েছি সে সব তোমারই। তুমি প্রকাশ করতে চাইলে, তুমি যেমন চাইবে তেমনই হবে, তোমার সিদ্ধান্তই আমি মেনে নেব। আমার চিঠির সঙ্গে তোমার লেখা কিছু চিঠিও পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়া ভালো। সব নয়, পাঠাতে চাই কয়েকটি নির্বাচিত পত্র যাতে ঐতিহাসিক পারম্পর্য থাকে। এই নির্বাচনের কাজ যা আমিই করছি। কিছু পাঠালাম প্রথম পর্বের চিঠি, যখন আমাদের ভিতর 'আপনি' সম্বোধন চলছিল। ১৯৯১ পার হয়ে '৯২ সালে পৌছাতে পৌছাতে উত্তরণ ঘটল 'আপনি' থেকে 'তুমি' সম্বোধনে। তারই ইঙ্গিত বহন করে রইল '৯১ আর '৯২-এর দুটি চিঠি। বাইরের পরিবর্তন বাহ্য, প্রথম থেকে আজ অবধি আমরা এই যাত্রাপথে চিরকালই ছিলাম মনে মনে ঘনিষ্ঠ। আমার এই সৌভাগ্যটুকুই পাঠকের জন্য উপহার রইলো, এর বেশী কিছু পাঠাতে আমি অক্ষম। ... এই সঙ্গে অভিবাদন জানাই মীজানুর রহমানকে, তিনি আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। ... দেশে যদি বা ছড়ায় বিদ্যে, আমাদের মধ্যে থাক অনিঃশেষ মিত্রতা।

আহমেদ সাহেব কেমন আছেন? মেয়েরা? ... সবাইকে জানাই আমার শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

অস্মান

১৯৯২ সালে প্রিয়ভাষিণীর লেখা একটি চিঠি আমরা উল্লেখ করছি যেখানে ফেরদৌসী অস্মান দত্তকে 'তুমি' বলে সম্মোধন করেছেনঃ

৬. ১. ৯২

মিনু ভিলা, রেল রোড, যশোর  
মঙ্গলবার  
শুক্রবার অস্মান,

অদর্শনের ত্রুটি 'বোধ হয়' মাঝে মধ্যে। তোমার চিঠি ও শুভেচ্ছা পেয়েছি সময় মতো। কিন্তু সংসারের অনেক ব্যন্তি আমার নিজস্ব সময়গুলোকে গ্রাস করে। আমার প্রয়োজনীয়তা নিজের কাছে যতটা নয়, তার চেয়ে এ সংসারের জন্য অনেক বেশী। তোমার একটি ছবি আমাকে পাঠাবে? ... অস্মান তুমি খুব সংক্ষিপ্ত চিঠি লেখো। কেন? একটু বড়ো লিখলে ভালো হয় না? .. আজ আমার বাগানে দোলন চাঁপা ফুল ফুটেছে। .. সামনে প্রদর্শনী এস এম সুলতানের সাথে, ঢাকার শিল্পকলা একাডেমীতে। তুমি বিশ্বাস করো আমার ঠিক এ ধরণের প্রশংসা পেতে একটুও ভালো লাগে না। ... আমার প্রকৃতি সংগ্রহ দেখে মানুষ বেশ অনাবিল আনন্দ বোধ করে, এজন্যই প্রদর্শন করি। আমি এগুলো কখনই বিক্রি করব না। ... জীবিকা নির্বাহের যথেষ্ট পথ আছে। ... তোমার জন্য অজস্র প্রীতি-

স্নেহধন্য - ফেরদৌসী

এর পরপরই মার্চ মাসে (১৯৯২) লেখা অস্মান দত্তের চিঠিতেও 'তুমি' সম্বোধনের স্থিকৃতি পাওয়া গেল। ২৫শে মার্চের চিঠিতে তিনি প্রিয়ভাষিণীকে লিখছেন:

২৫. ৩. ১৯৯২।

প্রিয় ফেরদৌসী,

স্বামী কন্যাসহ তোমাদের সুন্দর ছবিটি পেয়েছিলাম। এবার পাওয়া গেল একটি লিপিচিত্র। নামের সঙ্গে পরিচয় ছিল, আরো বেশি কিছু জানা হলো। যেমন আহসান সাহেব পঠনবিলাসী, রাজেশ্বরী ভোজনবিলাসী স্বভাবে ফুলেশ্বরীর সঙ্গেই বোধ হয় মায়ের মিল বেশি। দূর থেকে এই রকম মনে হলো। সবাইকে আমার ভালোবাসা জানাই। রঞ্জেশ্বরীকেও। বড় কম বয়সে বিয়ে করেছে রঞ্জা। এখন ভালো থাকলেই ভালো, শুভেচ্ছা জানানোই আমাদের কর্তব্য। রঞ্জেশ্বরীর সংসারযাত্রা শুভ হোক।

আমার কথা লিখছি। স্ত্রী বিদেশিনী। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্য পড়াতেন। এখান থেকে অবসর নিয়েছেন, ষাট বছর পূর্ণ হলে অবসর নিতে হয়। ইংল্যাণ্ডে open university'তে কাজ পেয়েছেন, সেখান থেকে শিগগির অবসর নেবার বাধ্যবাধকতা নেই। এখন ওদেশেই থাকবেন। ...

আমার এখানে এসে তোমার কিছুদিন থেকে যাবার ইচ্ছে আছে জেনে ভালো লাগছে। গানগুনে, গল্প করে ভালোই সময় কাটবে। একটা অসুবিধার কথা জানিয়ে রাখছি। কলকাতায় মাঝে মাঝেই load shedding চলে, অর্থাৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। তখন আমার নিউর মোমবাতি। ... যখন ইচ্ছে হবে স্বচ্ছন্দে চলে এসো। কষ্টটা ভাগ করে নেওয়া যাবে। ...

প্রীতি ও শুভেচ্ছায়, ইতি

অম্বান দত্ত

অম্বান দত্তের সাথে প্রিয়ভাষিণীর ঢাকায় দেখা হয়েছে ১৯৯৪ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে কোন এক সময়ে। সে সময় (সম্ভবত ফেব্রুয়ারিতে) অম্বান দত্ত ঢাকায় এসেছিলেন একটি সেমিনারে অংশ নিতে তখন তিনি দুদিনের জন্য ফেরদৌসীর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। এ কথা জানা যায় ১৪ই ফেব্রুয়ারিতে লেখা শ্রী দত্তের একটি ছোট চিঠিতে, যেখানে অন্য কথার সাথে লিখেছেন:

‘কলকাতা থেকে লিখছি। ... ঢাকায় তোমার বাড়িতে দু’রাত কাটিয়ে এলাম। সেই স্মৃতি ভুলবার নয়। তোমাদের সাথে পরিচয় আরো গভীর হলো।’

সংকলনটি শেষ হয়েছে ২০০৪ সালে প্রিয়ভাষিণীর ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের একটি চিঠি দিয়ে।

১৭. ৯. ০৮

বাসা ৩৮, সড়ক ৩

ধানমন্ডী, ঢাকা ১২০৫

অম্বান! প্রকৃতির বাহারি আচরণ ভালোই লাগে। যদিও বিরামহীন বর্ষণে জনজীবন বিপন্ন। তবুও বর্ষা আমার প্রিয় খ্রু। প্রিয় বন্ধু খ্রু। শরৎ না হয় একটু পরেই আসুক। এই অবোর বৃষ্টিধারায় তোমার চিঠি পেয়ে ভীষণ ভালো লাগলো জানো? জীবনে না পাওয়ার যে দুঃখগুলো এভাবেই পাওয়া যায়। তোমাকে অনেক কিছু বলার ছিলো। কিছুই তো বলা হলো না। ‘সাঁকো’র সম্পাদককে চিঠি পৌছে দিয়েছি। যথেষ্ট মুদ্রণের ক্রটি। যদি মনে করো, লেখা আমাকে পাঠালে আমি দেখে দিতে পারি। দেশটা ভালো নেই। আমরাও ভালো থাকছি না। বহুদিন বাংলাদেশে কোনো ভালো খবর নেই। তোমার সংহতি আমাদের সম্বল। ভালো থেকো। ভালোবাসা জেনো।

প্রিয়ভাষিণী

১৯৯৩ এর পর বেশ কবার দেখা হয়েছে, তবে শেষ দেখা ২০০২ সালে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দক্ষিণ এশিয় সম্মেলনে। অম্বান দত্ত প্রিয়ভাষিণীর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন অম্বান বদনে। প্রত্রালাপ অবশ্য এখনও অব্যাহত- বললেন, ‘শেষ চিঠি পেয়েছি ২০০৭ সালের অক্টোবরের শেষে। প্রায় সাথে সাথেই জবাব দিয়েছি।’

সে চিঠিটা দেখাতে পারলেন না, চিঠির ঝাপিতে রাখা অনেক চিঠির মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে খুঁজলেন কিন্তু পেলেন না। পরিবর্তে ১৯৯৬ সালে লেখা অম্বান দত্তের একটি চিঠি দেখালেন। চিঠিটি একবারেই ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রসঙ্গে ভরা। এটিও আমরা পাঠককের জন্য উপহার হিসেবে তুলে ধরলাম:

শান্তিনিকেতন

১৮।৩।১৯৬

প্রিয়ভাষিণী,

বাংলাদেশের অবস্থা ভাল দেখছি না। তোমরা এর ভেতর কেমন আছ? সর্বত্র অশান্তি। বাইরের দুন্দু অশান্তি তোমার ঘরের ভিতরেও ঢুকেছে কি না কে জানে!

আহমেদ সাহেব কেমন আছেন? ওর চোখের চিকিৎসা এখন কোন পর্যায়ে? অঙ্গোপচার হবে না কি? কবে? কোথায়? শিশুসহ রত্নেশ্বরীর খবর কী? ফুলেশ্বরীর লেখাপড়া কেমন চলছে? তুমি কি শিগ্নিরই আবার এদিকে আসবে? এগ্রিলের প্রথম সপ্তাহে আমি শান্তিনিকেতনে থাকব না। পুণেতে আমাকে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে হবে। পুণে থেকে কলকাতায় ফিরব সম্ভবত এগ্রিলের ১৪ তারিখে।

এখানে গরম পড়ে গেছে। এখনও মৃদু। কয়েকদিনের ভিতরই গরম আরো বাড়বে। বাইরের উত্তাপের সাথে যোগ হবে ইলেকশনের উত্তাপ। সব মিলে অনুমান করা যায় মে মাসে উত্তাপ হবে প্রচণ্ড।

এই উত্তপ্তি আবহাওয়া আর নানা ব্যস্ততার মধ্যে তোমার

শিল্পকর্ম কেমন চলছে? তসলিমার কোনো খবর আছে? ও কি এখন সুইডেনে না জার্মানিতে? সিদ্ধিকী সাহেব এবং আমার অন্যান্য বন্ধুরা কেমন আছেন?

ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা জেনো।

অম্বান

প্রিয়ভাষিণী শুধু আমাদের সংগ্রামের প্রতীক নন, বাংলার সৃষ্টিশীল জীবনমুখী শিল্পের এক উজ্জ্বল প্রতিনিধি। আফশোষ একটিই ১৯৭১’এ দুঃসহ দিনগুলোতে পাকিস্তানী পশু শক্তির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন তিনি, তা আজও অসমাপ্ত; যেদিন যুদ্ধপরাধীদের প্রতীক গোলাম আজম-নিজামী গংদের ও নিয়াজী-টিক্কা-ফরমান আলীরা বিচারের অপরাধী সাব্যস্ত হবে সেদিনই ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর অসমাপ্ত যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে। কিন্তু সেদিন কবে আসবে, বা আদৌ আসবে কি?

উষ্ণ হাত মিলিয়ে যখন ফেরদৌসী ও আহসান সাহেবকে বিদায় শুভেচ্ছা জানিয়ে গৃহত্যাগ করলাম তখন রাত নটা পেরিয়ে গেছে। বিদায়ের প্রাক্কালে প্রিয়ভাষিণীকে একান্তে বললাম, ‘আপনি এ যুগের একদিকে চিরাঙ্গদা, অন্যদিকে দ্বৌপদী- মহাভারত থেকে উঠে এসেছেন।’ ওরা দুজনেই সশ্নেদে হেসে উঠলেন।